IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

সমকালীন বাংলার বিভিন্ন জেলায় ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলনের বিস্তার

The Spread Of The Quit India Movement Of 1942 In Various Districts Of Contemporary Bengal.

সুব্রত বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

কালিনগর মহাবিদ্যালয়

উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

সারাংশ (Abstract):

১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলন ছিল মহাত্মা গান্ধী তথা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত সর্বাধীক সফল আন্দোলন। ভারতছাড়ো আন্দোলন গান্ধীজি পরিচালিত পূর্বের আন্দোলন গুলির মত সম্পূর্ণ অহিংস ছিল না। সারা ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে অহিংস নীতি ও আদর্শের পাশাপাশি হিংসাত্মক নীতি ও আদর্শ সমান্তরালভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। গান্ধীজি শেষ স্বাধীনতা আন্দোলন হিসাবে এই আন্দোলন আহ্বান করেন এবং জনগণের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল –''করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'', 'হয় দেশ স্বাধীন করব, না হলে মরব'। সারা ভারতের মত সমকালিন বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় ভারতছাড়ো আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। বাংলার উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের পর ও আপামর জনসাধারণ স্বতঃস্পূর্তভাবে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। ১৯৪২ এর ৯ই আগস্ট থেকে প্রায় ১৯৪৪ এর জানুয়ারী পর্যন্ত আন্দোলন চলেছিল। বাংলার এই আন্দোলনে ছাত্র-যুব সমাজ, নারীরা, শ্রমিক-কৃষক, এমনকী সরকারী চাকুরীজীবী মানুষের একটা অংশ, বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সদস্য, বহুবিধ রাজনৈতিক দলের কর্মী প্রভৃতি সমাজের প্রায় সব শ্রেণীর মানুষ যোগদান করেছিল। কলকাতা, মেদিনীপুর,ঢাকা,খুলনা, নদীয়া, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় আন্দোলন বৃহত্তর রুপ ধারণ করে। ভারতছাড়ো আন্দোলনের মাধ্যমে হয়তো স্বাধীনতা আসেনি, কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে অন্যতম ভীত তৈরি করে দেয়। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এই আন্দোলন যে রুপ লাভ করেছিল তা বাংলার অধিবাসী হিসাবে আমাদের গর্বিত করে।

শব্দসূচক(Keywords):

ভারতছাড়ো, জাতীয় কংগ্রেস, আন্দোলন, বাংলা, স্বাধীনতা, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদ, গণজাগরণ, অহিংসা, বিপ্লবী কর্মপন্থা, জাতীয় সরকার।

ভূমিকা(Introduction):

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতীয় গণ আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন সর্বাধীক উল্লেখযোগ্য আন্দোলন। এই আন্দোলনেই প্রথম সর্বভারতীয় স্তরে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য সামনে রেখে ব্রিটিশ শাসন অবসানের আহ্বান করা হয়। ভারতছাড়ো আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের সব কটি ধারা,পথ এবং মতাদর্শকে এক মিলনতীর্থে রুপান্তরিত করে। সমকালীন বাংলায় ভারতছাড়ো আন্দোলনের

ক্ষেত্রে ও এই সমন্বয় ঘটেছিল। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরবর্তী এক বছরের অধিক সময় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষ প্রায় সমবেতভাবে প্রকাশ্য এবং অন্তর্নিহিত কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে ভারতছাড়ো আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট ভোরবেলা মহাত্মা গান্ধী সহ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সকল নেতার গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সমগ্র ভারতের সাধারণ মানুষ অভূতপূর্ব গণ আন্দোলন শুরু করে। সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট বা হরতাল প্রভৃতির মাধ্যমে জনজাগরণের প্রকাশ ঘটে। একই সাথে জনগণ বিপ্লবী কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেলপথ, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সড়ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং থানা দখল, অস্ত্রাগার ও অর্থভাণ্ডার লুঠ, আদালত ও অনান্য সরকারী অফিসে আক্রমন অথবা অবরোধ গড়ে তোলে। বাংলার বিভিন্ন জেলাতে ও ৯ই আগস্ট থেকে একইভাবে ভারতছাড়ো আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উল্লেখযোগ্য ভাবে আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল কলকাতা,মেদিনীপুর,নদীয়া,ঢাকা,খুলনা সহ বেশকিছু জেলাতে। যদিও সর্বোত্র আন্দোলনের ধরণ একই রকম ছিল না।

গবেষণা পদ্ধতি(Research Methodology):

প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নথিপত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আধুনিক গবেষকদের রচিত নানাবিধ তথ্যসমৃদ্ধ রচনাবলী উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনায় অতি অবশ্যই গবেষণা ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য পর্যালোচনামূলক এবং তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বতভাবে প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে গুনগত গবেষণার মান বজায় রাখার বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য(Aims and Objectives of the Research):

- ভারতছাড়ো আন্দোলনে সমকালীন বাংলার মানুষের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করা।
- সর্বভারতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের পরেও কীভাবে আঞ্চলিক নেতা ও সাধারণ মানুষের যৌথ জাগরণ এতবড় আন্দোলন সংগঠিত করলো তা অনুসন্ধাণ করা।
- বাংলা প্রদেশের ভারতছাড়ো আন্দোলনে গান্ধীজির ''করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'' আহ্বানের পাশাপাশি সুভাষ চন্দ্র বসুর দেশ ত্যাগ ও বিদেশ থেকে ভারতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানের প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
- বাংলার বিভিন্ন জেলার ছাত্র-যুব ও নারী সমাজ এই আন্দোলনে কতটা সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল তা অনুসন্ধান করা।
- কংগ্রেস দলের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিপ্লবী দল কতটা আন্দোলনে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল তা উপলব্ধি করা।
- মেদিনীপুরের ভারতছাড়ো আন্দোলনে সেখানকার জনসাধারণের চিরস্মরণীয় অবদানকে পুনঃস্মরণ করা।
- সর্বভারতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা প্রদেশের আন্দোলন কতটা উল্লেখযোগ্য ছিল তা অনুসন্ধাণ করা।
- বাংলা প্রদেশের আন্দোলন কতটা গণচরিত্র লাভ করেছিল অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষ কতটা সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল তা বিশ্লেষণ করা।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ(Interpretation and Analysis):

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং আন্দোলনের সূচনা কীরুপ পরিস্থিতির মধ্যে হয়েছিল। ক্রিপশ মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান,নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু-র দেশত্যাগ এবং বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে দেশকে স্বাধীন করার বার্তা,অপ্রতিহত গতিতে জাপানের ভারতের মূল ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর এবং ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের আচরণ গান্ধীজিকে আন্দোলনের নীতি ও আদর্শ পুনঃমূল্যায়নের ভাবনায় পরিচালিত করে। ১৯৪২ এর ২২শে এপ্রিল হোরেস আলেকজাণ্ডারকে লেখা গান্ধীজির চিঠির বিষয়, ৪ঠা থেকে ১০ই জুন সেবাগ্রাম আশ্রমে আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিশারকে গান্ধীজির ভবিষ্যৎ আন্দোলন সংক্রান্ত সাক্ষাৎকার প্রভৃতি থেকেই তাঁর আন্দোলন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাই ১৯৪২ সালের ৭ই জুন হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজি একটি প্রবন্ধে লেখেন-''বিদেশী জোয়াল ছুঁড়ে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় যতখানি অহিংস শক্তি গড়ে তোলা দরকার, তার জন্য অপেক্ষা করে এখন আমার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। তাই ঠিক করেছি, কিছু ঝুঁকি থাকা সত্বেও আমি জনগণকে দাসত্ব প্রতিরোধ করতে আহ্বান জানাব (কলকাতা মহানগরী এবং সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন-ড.কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ-১)। জাতীয় কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে মতবিরোধ সত্বেও ১৯৪২ এর ১৩ই জুলাই ওয়ার্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটি একটি ভারতছাড়ো প্রস্তাবের খসড়া পেশ করে। ১৪ই জুলাই সভায় গান্দীজি এই প্রস্তাবের সংশোধিত খসড়াতে স্বাক্ষর করেন। যেখানে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারকে ভারত পরিত্যাগ করার কথা বলা হয় এবং বলা হয় ভারতবাসী নিজেরাই এককভাবে জাপানী শক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম। ২৪শে জুলাই অন্ধ্র কংগ্রেস গণন্দোলনের একটি কর্মসূচীও ঘোষনা করে। ২৯শে জুলাই অন্ধ্রপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গণ আন্দোলনের প্রথম প্রামান্য নির্দেশাবলী প্রকাশ করলে অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেস ও বৃহত্তর গণ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

৫ই আগস্ট, ১৯৪২ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আন্দোলন সম্পর্কিত চূড়ান্ত পর্যালোচনার জন্য বৈঠকে বসেন এবং এ.আই.সি.সি. অধিবেশনে পেশ করার জন্য খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন করে। ৭ই আগস্ট বোম্বাইতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনার পর ৮ই আগস্ট ঐতিহাসিক ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহিত হয়। প্রস্তাব গ্রহণের পর গান্ধীজি তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে বলেন—''এই মুহূর্ত থেকে আপনারা প্রত্যেকে নিজেকে একজন স্বাধীন পুরুষ অথবা নারী মনে করবেন এবং এমনভাবে চলবেন যেন আপনারা স্বাধীন সাম্রাজ্যবাদের পদানত নন।----- আমি আপনাদের সংক্ষিপ্ত একটি মন্ত্র দিচ্ছি, আপনাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে তার প্রকাশ ঘটুক। মন্ত্রটি হল-'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে', হয় আমরা দেশকে স্বাধীন করব অথবা মরব।---- স্বাধীনতা কাপুরুষ বা দুর্বল চিত্তের জন্য নয়।--- এটি একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এই লড়াইয়ে গোপনীয়তা পাপ।''(D.G. Tendulkar, Mahatma, Vol.6, Publication Division, Govt. of India,1969 Reprint,p.154-68). কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবে বলা হয় গণসংগ্রাম হবে অহিংস পদ্ধতিতে ব্যাপকতর আকারে। আন্দোলন কারীকে নেতৃত্বের অবর্তমানে পথ স্থির করতে হবে সাধারণ নির্দেশাবলীর গণ্ডীর মধ্য থেকে। স্বাধীনতার দুর্গম পথে মুক্তিকামী প্রতিটি ভারতবাসী নিজেই হবে নিজের পথ প্রদর্শক।

৮ই আগস্ট কংগ্রেসের এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরদিন অর্থাৎ ৯ই আগস্ট প্রত্যুষে গান্ধীজি সহ সকল প্রধান প্রধান কংগ্রেস নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে পরেই সমস্ত দেশ জুড়ে এক অভূতপূর্ব গণ জাগরণ শুরু হয়। তবে ৯ই আগস্ট প্রত্যুষে মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ পরোয়ানা নিয়ে হাজির হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ভবিষ্যৎআন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও জনগণের উদ্দেশ্যে একটি লিখিত নির্দেশ নিজ স্ত্রীর নিকট রেখে যান। তাঁর আগস্ট আন্দোলন বিষয়ক এই শেষ নির্দেশে তিনি বলেন—'' Every man is free to go to the fullest length under Ahimsa by complete deadlock, strikes and all other possible non-violent means.'' (কলকাতা মহানগরী এবং সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন-ড. কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ-২২)। তিনি আরো

বলেন যে,'' আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে সাধারণ মানুষ যখন বেরিয়ে আসবে এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হবে, একমাত্র তখনি জাতির সৌভাগ্যের উদয় হবে"।(কলকাতা মহানগরী এবং সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন-ড.কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃঃ-২২)। গান্ধীজির গ্রেপ্তারের পর সুচেতা কৃপালিনী, রাম মনোহর লোহিয়া,গোপিনাথ বরদলুই প্রমুখ গান্ধীর শেষ নির্দেশনামা হাতে পেয়ে ৭০ জন প্রতিনিধি নিয়ে গোপনে এ.আই.সি.সি. সভা করেন। যেখানে স্থির হয় এ.আই.সি.সি. সদস্যরা গোপন আশ্রয় কেন্দ্র থেকে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করবেন। স্থির হয় একদিকে, আদালত, পুলিশ, তালুকদারদের বয়কট করা, ব্যাপক আকারে শ্রমিক ধর্মঘট ঘটানো ও লিফলেটের মাধ্যমে সকল প্রদেশে আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করা এবং অন্যদিকে নানাপ্রকার অন্তর্ঘাতমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এভাবে আন্দোলনের ১২ দফা কর্মসূচী নির্ধারণ করে তা হাতে লিখে ,সাইক্লোস্টাইল করে,ও টাইপ করিয়ে শত শত কপি বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানোর ব্যাবস্থা করা হয়। ১০ই আগস্ট ও ১১ই আগস্টের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে এই কর্মসূচী ছড়িয়ে পড়ে এবং মূলতঃ এর উপর ভিত্তি করেই সারাদেশে সুগঠিত আন্দোলন গড়ে ওঠে। সমগ্র দেশেই দুটি পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে – প্রথমত, প্রকাশ্য গণ আন্দোলন, সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট বা হরতাল ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবী কর্মপন্থা যথা- রেল,ডাক,টেলিফোন,টেলিগ্রাফ,সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা ও থানা,অস্ত্রাগার,সরকারী অর্থ সম্পদ লুঠ এবং সর্বপরি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা। সেপ্টেম্বর মাস থেকে Central Directorate of AICC গঠন করে এই সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন কর্মসূচীর পরিচালনা করা হতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশে পরিবর্তীত নীতি ও কৌশল প্রেরণ করা হত। এই সময় কংগ্রেস গেরিলা যুদ্ধ কৌশল গ্রহনের জন্য 'আজাদ দস্তা' গেরিলা দল গঠনের কথা বলেন।

সমকালীন বাংলাতে ও ভারতছাড়ো আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এই পর্বে বাংলায় পূর্ব হইতেই আন্দোলনের একটি প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান এশিয়ায় অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং জাপানের অভিমুখ ছিল ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। তাই কলকাতা আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার সেই আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতির লক্ষ্যে বাংলার মাঝিদের সমস্ত নৌকা ডুবিয়ে দেয় বা অধিগ্রহণ করে, মেদিনীপুরে বাস চলাচল প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রন করা হয়, গ্রামের মানুষের থেকে সাইকেল কেড়ে নেওয়া হয়,সকল মজুত খাদ্য শস্য লুঠ বা ধ্বংস করা হয়, কোনরুপ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই গরুর গাড়ীগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং সামরিক বাহিনীর গ্রাম্য নারীদের অত্যাচার ও ধর্ষণ প্রভৃতি কারণে বাংলার মানুষ মানসিকভাবে পূর্ব থেকেই সরকার বিরোধী হয়ে উঠেছিল। সুভাষ চন্দ্র বসু-র দেশ ত্যাগ ও বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করার বার্তা ও সেকাজে জনগণকে আহ্বান এই অসন্তোষকে বিপ্লবে বিস্ফোরিত করার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ রুপে প্রস্তুত করে। এই প্রেক্ষাপটেই কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন জেলায় ভারতছাড়ো আন্দোলন আছড়ে পড়ে।

কলকাতাঃ

যদিও সুগঠিত আন্দোলন কলকাতায় গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি বাধা ছিল যে, ১৯৩৯-৪০ সাল থেকেই বাংলার কংগ্রেস দলে নেতাজী পন্থী এবং মূল কংগ্রেস পন্থী এই দুদলে বিভাজন। তবে সম্ভাব্য বৃহৎ আন্দোলনের লক্ষ্যে ১৯৪২ এর জুলাই মাস থেকেই ড: প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টায় বাংলার সব জেলার নেতাদের সংগঠিত করার প্রয়াস শুরু হয়। ১৯৪২-এর ৯ই আগস্টের পর থেকে বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ,যুগান্তর দলের সদস্য, ফরওয়ার্ড ব্লক দলের সদস্য,কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের সদস্য, রেভোলিউশনারি সোস্যালিস্ট দলের সদস্য, কংগ্রেস লেবার দলের সদস্য এবং শ্রীসংঘ প্রভৃতি দলের সকল সদস্য বিভিন্ন জেলায় সাধারন ছাত্র-যুব, শ্রমিক-কৃষক, নারী-পুরুষ সকল শ্রেণীর মানুষের জাগরিত আন্দোলনী শক্তিকে ব্যাবহার করে নানাভাবে ভারতছাড়ো আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন জেলায় ভারতছাড়ো আন্দোলন এক সর্বাত্বক রুপ লাভ করে।

১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট কলকাতায় প্রভাতী সংবাদপত্রে মহাত্মা গান্ধী সহ সকল জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বয়কট করে ছাত্র-ছাত্রী সকলে পথে নেমে ব্রিটিশ বিরোধী শ্লোগান দিতে শুরু করে। তারা শোভাযাত্রা করে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে বিকেলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সমবেত হয় এবং 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক','করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে থাকে। কলকাতায় প্রথম এভাবে ছাত্ররা স্বতঃপ্রনোদিত সভা ও প্রতিবাদ করে। পুলিশ যদিও তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ইতিমধ্যে ১০ই আগস্ট বাংলার ব্রিটিশ শাসক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে বেআইনি ঘোষনা করে। তথাপি পরের দিন ১০ই আগস্ট সন্ধ্যায় মির্জাপুর স্ট্রিটের আর্যসমাজ হলে ছাত্ররা প্রতিভা রায়চৌধুরীর পরিচালনায় একটি সভা করে এবং ১২ই আগস্ট থেকে ব্যাপক ছাত্র-যুব আন্দোলনের কথা ঘোষনা করে। সমস্ত রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাত্র-যুবদের এখানে যোগদানের আহ্বান করা হয়। এছাড়া লাগাতার যতদিন না স্বাধীনতা প্রাপ্তি হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন সংগঠিত করার কথা বলা হয়। কলকাতা সহ পাশ্ববর্তী স্থানে এইসব আন্দোলন পরিচালনা করেন-অরুণ সেন, অমর মূখ্যার্জী, বরেন দাঁ, প্রহ্লাদ দে, ত্রিবেনী বর্ধন, বিনয় রায়, শিশির পত্রনবিশ, গৌরি সেন, সুবোধ চক্রবর্তী, বনলতা সেন, প্রতিভা রায়চৌধুরী, নির্মলা রায়, গোপেশ্বর দাঁ, অমরগোপাল নন্দী, ধীরেন ভৌমিক, পঞ্চানন সিংহ, প্রশান্ত দত্ত, কৃষ্ণ চ্যাটার্জী, সুধীন কুমার, সনৎ রায়চৌধুরী, পূর্ণাংশু রায়, দ্বারিক দে, রবি দাশগুপ্ত, দিলীপ কুমার বিশ্বাস, সমরেন্দ্র নাথ বসু, পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যাক্তি। ১২ই আগস্ট ছাত্র যুবরা কলকাতায় ছয়টি পৃথক মিছিল এবং পৃথক সভা করে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' শপথ গ্রহণ করে। ১৩ই আগস্ট সকাল থেকে কলকাতার প্রায় প্রতিটি স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট শুরু করে। উত্তর কলকাতার একটি বিরাট ছাত্র ও সাধারণ মানুষের মিছিল প্রতিটি কলেজের সামনে সভা করে। 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো', 'কংগ্রেস নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি চাই' প্রভৃতি শ্লোগান দিতে দিতে প্রধান সভাস্থল ওয়েলিংটন পার্কে, শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ,খিদিরপুর,ভবানীপুর,যাদবপুর এমনকি হাওড়া ও দূরবর্তী অঞ্চল থেকে ও মিছিল এসে সমবেত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে ও টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ভবানীপুরের জগু বাজারে একটি মিছিলে পুলিশ ব্যাপক লাটিচার্জ করলে মিছিল খণ্ড খন্ড হয়েই সভাস্থল অভিমুখে যেতে থাকে। সুষমা রায় ও কল্যানী মুখার্জী পরিচালিত শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে আগত মিছিলে ও পুলিশ আক্রমণ করে। ওয়েলিংটন পার্কের মূল সভায় পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলি চালনার কারণে বেশ কয়েকজন আহত হন। ক্ষিপ্ত জনতা তিনটি ট্রাম গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। বিকাল তিনটে নাগাদ মেডিকেল কলেজ,কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ এবং ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের প্রায় ৫-শত শিক্ষার্থী মিছিল করে মূল সভার দিকে অগ্রসর হলে মিশন রো-র মাঝামাঝি পুলিশের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব বাধে। পুলিশ ওয়েলিংটনে প্রবেশের সমস্ত পথ ব্লক করে দেয়। কলেজ স্কোয়ার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁদ থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ক্রমাগত ইট- পাথর ছোঁড়া হয়। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশ আহত হয়, মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররা তাদের চিকিৎসা করতে অস্বীকার করে। মূল সভা স্থলে জমায়েত হওয়া জনতা ''করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'' শপথ গ্রহণ করে। শ্রীমানি বাজারের নিকট পুলিশের গুলিতে বৈদ্যনাথ সেন নিহত হন। যিনি কলকাতায় আগস্ট আন্দোলনের প্রথম শহীদ ছিলেন।

পরের দিন ১৪ই আগস্ট কলকাতার গণ আন্দোলন ব্যাপক রুপ লাভ করে। বৈদ্যনাথ সেনের মৃতদেহ নিয়ে শান্তি মিছিল কারী জনতার উপর পুলিশের গুলি বর্ষনের কারণে নিরীহ পথচারী দিলীপ কুমার ঘোষ নিহত হন। কলকাতার সর্বত্র দোকান,বাজার সব বন্ধ থাকে, আন্দোলন রত ক্ষিপ্ত জনতা টেলিগ্রাফ,টেলিফোন লাইন কেটে দেয়, ডাকঘর পুড়িয়ে দেয় এবং পোস্ট বক্স,ইলেকট্রিক ফিউজ বক্স, ফায়ার অ্যালাম বক্স ও ল্যাম্প পোস্ট ভেঙ্গে দেয়। বিভিন্ন স্থানে পথ অবরোধ করা হয়। পুলিশ ৫-৬ স্থানে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি বর্ষন করলে ৬ জন মারা যায় এবং প্রায় ৭০ জন আহত হয়। কলকাতার সমস্ত স্কুল- কলেজ একবারে বন্ধ হয়ে যায়। ১৫ই আগস্ট থেকে কলকাতা যুদ্ধের চেহারা নেয়। সমস্ত কলকাতা জুড়ে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়। ইলেকট্রিক পোস্ট বা ফিডার পিলার ধ্বংস করতে দেখলে সরাসরি গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮ই আগস্ট থেকে কলকাতার সকল সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে 'ভারত' পত্রিকা আন্দোলনের কথা এবং পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে থাকলে

পুলিশ দ্রুত এই পত্রিকার দপ্তর বন্ধ করে দেয়। ১৯৪২ এর ৮,৯,এবং১০ ই সেপ্টেম্বর কলকাতার স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা লাগাতার আন্দোলন করতে থাকে। ৯ই ডিসেম্বর কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের চার মাস পূর্তি উপলক্ষ্যে ছাত্ররা বৃহৎ মিছিল সংগঠিত করে এবং ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে। ১০ই ডিসেম্বর হ্যারিসন রোডে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। ১৯৪৩ এর ২৬ জানুয়ারী কলকাতার ছাত্ররা এবং সাধারণ মানুষ জাতীয় পতাকা নিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ১৯ শে ফেব্রুয়ারী হেমু কালানী দিবস পালন করা হয় সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা করা হয় এবং 'রক্তের বদলে রক্ত চাই', 'ব্রিটিশ সরকারের পতন চাই' প্রভৃতি শ্লোগান দেওয়া হয়। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে অনেক আন্দোলনকারী আহত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কটিশচার্চ কলেজে প্রায় ১৫০০ শিক্ষার্থী প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এই মাসের ২৩ তারিখ অনশনরত গান্ধীজির মুক্তির দাবীতে বৃহৎ সমাবেশ করা হয়। ২৬ তারিখ তারা জেল ভেঙ্গে গান্ধীজিকে মুক্ত করা এবং বিপ্লবী জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলে সমাবেশ করে। মার্চ মাসেও একাধীক সভা-সমাবেশ করা হয়। ১৯৪৩ এর Bengal Congress bulletin in April-এর সংখ্যায় ৬ই এপ্রিল পতাকা দিবস পালন এবং হাজার শিক্ষার্থীর সভা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে পতাকা উত্তোলনের কথা জানা যায়। ১৯৪৩ এর ৯ই আগস্ট সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে দিনটি স্মরণ করা হয়। ২রা অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি জনসভা করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

কলকাতার এই আন্দোলনে নারীদের এবং বেশ কিছু ব্যক্তি চালিত প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা ছিল। নারীদের মধ্যে নির্মলা রায়,বাণী ঘোষ,লীলা রায়,চিত্রা বসাক, বনলতা সেন, সুষমা রায়, হেলেনা দত্ত, ছায়া গুহ, আভা মজুমদার প্রমুখ নারীরা আন্দোলনে সরাসরি নেতৃত্ব দান করেন। এছাড়া প্রচুর নারী সদস্য গোপনে লিফলেট বন্টন,পিস্তল,বোমা বারুদ বা অন্যান্য বিপ্লবী সামগ্রী সঠিক স্থানে পৌছিঁয়ে দেন। অন্যদিকে কলকাতা কালচার ক্লাবের সদস্যরা, সিমলা ব্যায়াম সমিতি,রাজবল্লভ পাড়া ব্যায়াম সমিতি,তরুন-বোসপাড়া-দেশগৌরব প্রভৃতি ব্যায়াম সমিতি এবং সংগঠন গুলি মুলতঃ অন্তর্ঘাতমূলক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

মেদিনীপুরঃ

কলকাতার বাইরে সমকালীন বাংলায় ভারতছাড়ো আন্দোলনের কথা বলতে হলে প্রথমেই মেদিনীপুর জেলার কথা বলতে হবে। ১৯৪২-এ এই জেলায় ঘটেছিল গণবিদ্রোহ। মেদিনীপুর জেলার আপামর জনসাধারন তাদের নেতাদের আহ্বানে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তা সর্বভারতীয় ভারতছাড়ো আন্দোলনের ক্ষেত্রে মেদিনীপুরকে সম্মানিত করে। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন—''১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে সারা ভারতে যে অহিংস ও সহিংস আন্দোলন হয়, তাহাতে বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীগণ শীর্ষস্থান অধিকার করে। কালানুক্রমে চট্টগ্রাম বিপ্লবের পরে হইলেও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী বিবেচনা করিলে আগস্টের এই আন্দোলনই ইংরেজ শাসনকালে বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান হিংসাত্মক বিদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য''।(মজুমদার রমেশ চন্দ্র,বাংলাদেশের ইতিহাস ৪তুর্থ খণ্ড,পৃঃ ৩৬৫-৬৬)। মেদিনীপুর তমলুক মহাকুমার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম। ২৪শে সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রামের নেতারা একটি সভা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে ২৯ তারিখ বিভিন্ন দিক থেকে একসঙ্গে থানা,আদালত ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর আক্রমণ করা হবে। সেজন্য তারা 'বিদ্যুৎ বাহিনী' নামে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করে। ২৮ তারিখ রাতে বড় বড় গাছ কেটে রাস্তা অবরুদ্ধ করা হয়,রাস্তার সংযোগকারী সেতুগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়। পরিকল্পনানুসারে ২৯ তারিখ প্রায় ২০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী মানুষ পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ করে। খেজুরী, পটাশপুর, সুতাহাটা থানা বিদ্রোহী জনগণ দখল করে নেয়। তমলুক থানা দখল অভিযানে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন ৭০ বছরের বৃদ্ধ সত্যাগ্রহী মাতঙ্গিনী হাজরা। পুলিশের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ জনতাকে তিনি গান্ধীর আহ্বানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে পুনরায় বিক্রমের সহিত থানা ও মহাকুমা শাসকের দপ্তর দখলে অগ্রসর করেন। পুলিশ তাঁকে পরপর দুটি গুলি করলে তিনি

'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে জাতীয় পতাকা হাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আত্মত্যাগের খবরে অনুপ্রাণিত জনতা সুতাহাটা ও মহিষাদল থানা ও দখল করে। ভগবানপুর থানা দখলের চেষ্টা করে। ১৯৪২-এর অক্টোবরের মধ্যে সুতাহাটা,পটাশপুর এবং খেজুরী থানা এলাকায় জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সামগ্রিক অভিযানে প্রায় ৩০ জন সত্যাগ্রহীর মৃত্যু হয়। কাঁথি মহাকুমাতে ও ৮ হাজার মানুষ পৃথক পৃথক দলে ভাগ হয়ে প্রতি ইউনিয়নে দপ্তর স্থাপন করে। সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আন্দোলনে যোগ দেন এবং স্কুল, কলেজ, বাজার, পরিবহন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পিছাবনী গ্রামে বিদ্রোহী জনগণকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করলে তারাও পাল্টা সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করে,থানা ডাকঘর পুড়িয়ে দেয়। স্থানে স্থানে পুলিশ ও জনতা খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৬ই অক্টোবর প্রবল ঘুর্ণিঝড় মেদিনীপুর শহরকে ছারখার করে দেয়। তথাপি বিদ্রোহী নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় জানিয়ে দেন যে কোন মূল্যে আন্দোলন সক্রিয় রাখতে হবে। সতীশ চন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ধাড়া,সতীশ চন্দ্র সাহ, বরদাকান্ত কুইতি প্রমুখের সুচিন্তিত বিপ্লবী প্রয়াসের ফল স্বরুপ ১৯৪২- এর ১৭ই ডিসেম্বর জন্মনিল ''স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার''। জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধীনায়ক ছিলেন সতীশ চন্দ্র সামন্ত। অর্থসচিব এবং স্বরাষ্ট্র সচিব হন যথাক্রমে অজয় মুখোপাধ্যায় এবং সুশীল কুমার ধাড়া। বিদ্যুৎবাহিনী হল জাতীয় সরকারের সেনাদল। এছাড়া গেরিলা ও নারী বাহিনী গঠিত হল। সরকার নিজস্ব থানা এবং জেলা গড়ে তুলল। অর্থসংগ্রহের জন্য তারা জমিদারের সম্পদ লুঠ, জোতদারদের থেকে জরিবানা আদায় এবং অপহরণ ও ব্রিটিশ কোষাগার লুঠ করার সিদ্ধান্ত নিল। ঘুর্ণিঝড়ে আক্রান্তদের জাতীয় সরকার সহযোগিতা করতে থাকে। সরকার বিচার,আইনশৃঙ্খলা,স্বাস্থ্য,শিক্ষা এবং কৃষি দপ্তর ও প্রতিষ্টা করে। ব্রিটিশ সরকারের সর্বতঃ অমানবিক কার্যাবলী সত্বেও এই জাতীয় সরকার স্বসম্মানে নিজেদের অস্তিত্ব ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধরে রেখেছিল। ইতি মধ্যে সতীশ সামন্ত গ্রেপ্তার হলে অজয় মুখোপাধ্যায় সর্বাধীনায়ক হন। তিনি গ্রেপ্তার হলে সুশীল কুমার ধাড়া আন্দোলন চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এমন গুপ্ত বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের কথা বললে জাতীয় সরকার নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা করে ১লা সেপ্টেম্বর জাতীয় সরকারের অবসানের কথা বলে এবং শেষ পর্যন্ত ২৯শে সেপ্টেম্বর এই সরকারের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজি তমলুকে এসে বলেছিলেন—''তোমাদের সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আমি প্রশংসা করি। তবে তোমরা অহিংসার পথে থাকলে আমি আরও খুশী হতাম।''(তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি,সর্বাধিনায়ক পৃঃ ৬০-৬৩)। এভাবে মেদিনীপুরের মানুষ ভারতছাড়ো আন্দোলনে এক অসীম বীরত্বের সর্বাত্মক উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল।

২৪ পরগণাঃ

২৪ পরগণা জেলার ভারতছাড়ো আন্দোলন মূলতঃ গড়ে উঠেছিল অন্তর্ঘাতমূলক কর্মপন্থা অবলম্বনে। প্রকাশ্য সভা বা মিছিল খুব কম হয়। কিন্তু ট্রেনে অগ্নিসংযোগ,মিলিটারী টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেললাইনের ফিসপ্লেট তুলে ফেলা প্রভৃতি গোপন অন্তর্ঘাতমূলক কার্য নিয়মিত সংঘঠিত হয়েছিল। ১৯৪২-এর আগস্ট থেকে ১৯৪৩-এর জানুয়ারী মাসের মধ্যে প্রত্যহ মাইলের পর মাইল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন তার কাটা হয়। ১৮ ও ১৯ আগস্ট, ১৯৪২ কালীঘাট, ফলতা রেললাইনে ১২টি ফিসপ্লেট তুলে ফেলা হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৯-এ জানুয়ারী ১৯৪৩-এর মধ্যে প্রায় ৭টি ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সাগরদ্বীপে পুলিশের গুলিতে একজন স্বেচ্ছাসেবীর মৃত্যু হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকুরিয়া স্টেশনের বুকিং অফিসের সমস্ত নথি বোমা মেরে ধ্বংস করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর অনশনকে সমর্থন করে যাদবপুর ও টিটাগড়ের ছাত্রযুবরা ধর্মঘট ও হরতাল করে। ২৫শে মার্চ ডায়মণ্ডহারবার কোর্টে জনতার ভুখা মিছিল হয়। এভাবে বিক্ষিপ্ত আন্দোলন চলতে থাকে।

হাওড়াঃ

কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলা হাওড়াতে আগস্ট আন্দোলনের শুরুতেই স্কুল,কলেজ-এর শিক্ষার্থী এবং কারখানা শ্রমিকরা সরাসরি বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান করে এবং স্বাধীনতার দাবী তোলে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি-র পক্ষ থেকে হাওড়ার সমস্ত শিল্প ইউনিটকে অনুরোধ করা হয় আন্দোলনে যোগদান করার জন্য। ১৯৪২-এর ২০ ও ২১ আগস্ট আন্দুল ও মৌরী বাজারে, ১৪ই সেপ্টেম্বর হাওড়া,শিবপুর ও বালি অঞ্চলে এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর জগাছা পুলিশ স্টেশনে সাধারণ মানুষ হরতাল করে। ২রা অক্টোবর প্রায় ১৫ হাজার আন্দোলনকারী ইংলিশ মাধ্যম স্কুল,থানা এবং সরকারী অফিস ধ্বংস করার শপথ গ্রহন করে। যদিও পুলিশ তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ১২ই ডিসেম্বর শ্যামপুর পুলিশ থানার অন্তর্গত চাঁদিপুরে সরকারী চালের নৌকা লুঠ করা হয়। প্রায় ১ বছর ধরে বিভিন্ন অন্তর্ঘাত মূলক আন্দোলন হাওড়া জেলাতে চলতে থাকে।

ঢাকাঃ

সমকালীন ঢাকা জেলাতে ১৯৪২-এর ১০ই আগস্ট ঢাকার স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণ ধর্মঘট করে। সাধারণ মানুষ তাদের সাথে যোগ দেয়। ১১ই আগস্ট ছাত্র মিছিলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। ১৩ই আগস্ট ক্ষিপ্ত জনতা ঢাকার মুনসেফ কোর্ট আক্রমণ করে নথিপত্র নষ্ট করে দেয়। পুলিশের সাথে দ্বন্দ্বে একজন নিহত হন। নারায়নগঞ্জ,মুন্সিগঞ্জ –এ হরতাল পালিত হয়। ১৪ই আগস্ট ঢাকার আন্দোলনকারীরা নিকটবর্তী ৮টি পোস্ট অফিসে অগ্নি সংযোগ করে। ঢাকেশ্বরী ও লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ১৫ই আগস্ট পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ৫জন নিহত হন। ক্ষিপ্ত জনতা গেণ্ডারিয়া স্টেশনে অগ্নিসংযোগ করে এবং রেললাইন ধ্বংস করে। পোস্ট অফিস পুড়িয়ে দেয়। ১৮ই আগস্ট থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা মুড়াপাড়া,মোহনগঞ্জ ও দেওভোগের পোস্ট অফিস ও আবগারী বিভাগের দোকান গুলিতে লুঠ করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর তালতলা সমাবেশে পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হন। নবাবগঞ্জে পুলিশ একজনকে হত্যা করে। ঢাকা জেলার সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন এভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

ফরিদপুরঃ

ফরিদপুরে ছাত্র-যুবরা বিভিন্ন স্থানে হরতাল ও শোভাযাত্রা করে। জনতা পোস্ট অফিস ও সরকারী ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। ৫ ও ৭ই সেপ্টেম্বর যথাক্রমে মাদারীপুরের শোভাযাত্রা এবং চিকান্দী মুন্সেফ কোর্ট-এর শোভাযাত্রায় পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। খাগড়া গ্রাম ও নারিয়াতে শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করতে গেলে পুলিশের সাথে জনতার তীব্র সংঘর্ষ হয়। ২১-এ সেপ্টেম্বর বিক্ষুব্ধ জনতা মাদারীপুরের গোঁসাইহাট পোস্ট অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। ফরিদপুরের ভাঙ্গা গ্রামে জনতা অত্যাচারী এক পুলিশ সাব ইনস্পেক্টরকে হত্যা করে। এখানে পুলিশী অত্যাচার এমন পর্যায় পৌঁছায় যে তদানিন্তন বাংলার প্রধানমন্ত্রী মি: ফজলুল হককে স্থানীয় অবস্থা শান্ত করার জন্য বঙ্গীয় আইন সভার সদস্যদের প্রেরণ করতে হয়।

বরিশালঃ

বরিশালের জনসাধারণ ও ভারতছাড়ো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ সরকার জাপানী আক্রমণের ভয়ে বরিশালের সাধারণ মানুষের থেকে জোর পূর্বক লক্ষ লক্ষ মন চাউল নিয়ে অন্যত্র পাচার করে। বরিশালের সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল,কলেজ ত্যাগ করে এবং আদালত বার লাইব্রেরিতে পিকেটিং শুরু হয়। পুলিশ এদের উপর লাঠিচার্জ করলে ক্ষিপ্ত জনতা স্টীমার স্টেশন ও পোস্ট অফিসে অগ্নি সংযোগ করে। বেশকিছু দিন বরিশালে পুলিশ জনতা খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে।

খুলনাঃ

খুলনা জেলার ছাত্র সমাজ,উকিল,শিক্ষক,চিকিৎসক,সাংবাদিক, বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১২ই আগস্ট খুলনার বি.কে. স্কুল ও মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীরা ভারতছাড়ো আন্দোলনের সমর্থনে ও নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হরতাল করে ও বিরাট শোভাযাত্রা বের করে। একই দিনে সেনাহাটি,চন্দনিমহল,আজোগড়া,খালিশপুর স্কুলের ছাত্ররা শোভাযাত্রা বের করে। ১৫ই আগস্ট খুলনা পৌরসভার কমিশনার শ্রীযুক্ত দেবরঞ্জন সেন সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে নিজ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৮ই আগস্ট কংগ্রেস দলের আহ্বানে খুলনায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। গান্ধী পার্কে ঐদিন বিশাল সমাবেশ হয়। সর্বসাধারণের বিরাট এক মিছিল 'বন্দেমাতরম', ও 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' ধ্বনি দিয়ে আদালতের দিকে অগ্রসর হয়। আদালত কক্ষের সরকারী তথ্য নষ্ট করা হয়। সরকারী পুলিশ ও জনতার মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। অমৃতবাজার পত্রিকায় (১৯-০৮-৪২) এই ঘটনার বিবরণ এই মর্মে প্রকাশিত হয়—''At Khulna, hartal was observed yesterday and all vehicular traffic in the town was suspended. A procession was brought out in the main thoroughfares and at about 10-30 A.M., processionists entered Criminal Court, the bar library and the Circuit Court, smashing the glass passes and breaking furnitures. The worst sufferer was the bar library. The demonstrators were, however, ultimately dispersed by the Police. The District Magistrate, the District Judge and the Superintendent of Police visited the affected areas after the disturbances. Several persons were reported to have been injured by stone-throwing by the demonstrator. (আগস্ট বিপ্লব ও বাংলা-সম্পাদনা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য,সজল বসু ও পবিত্রকুমার গুপ্ত, আগস্ট বিপ্লব সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন সমিতি, পৃঃ ১৬৬)।

এরফলে খুলনা শহরের আন্দোলনকারীদের গণহারে গ্রেপ্তার করা হয়। ১২ই আগস্ট বাগেরহাটে শিক্ষার্থীরা মিছিল করে এবং হরিসভা গৃহে সমবেত হয়। পরেরদিন হরিসভা গৃহে আন্দোলনের সমর্থনে একটি বক্তব্যের আয়োজন করা হয়। ১৪ই আগস্ট বাগেরহাটে পূর্ণ হরতাল হয় এবং নাশকতা মূলক কার্যের জন্য বাছাই করা ছাত্রদের নিয়ে 'অ্যাকশন কমিটি' গঠন করা হয়। বাগের হাটে নির্মল ভঞ্জের নেতৃত্বে একাধীক নাশকতা মূলক ঘটনা ঘটানো হয়। এখানে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জেলখানার উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয় ও স্থানীয় মুনসেফদের বাড়ী, লোকাল বোর্ডের অফিস পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে পুলিশের অত্যাচারের কারণে আন্দোলন শিথীল হয়ে পড়ে।

ময়মনসিংহঃ

ময়মনসিংহ জেলার শহরে নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বৃহৎ হরতাল পালিত হয়। শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদী শোভাযাত্রা বের করে। ৩১শে আগস্ট জনতা ইনকাম ট্যাক্স ও সেলস ট্যাক্স অফিস আক্রমণ করে। ৬ই সেপ্টেম্বর থেকে শহরে ১৪৪ ধারা জারি হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর সাধারণ মহিলা ও ছাত্রীদের পরিচালনায় এক বৃহৎ শোভাযাত্রা বের করা হয়। যদিও পুলিশ মিছিল কারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরের দিন জনতা মুক্তাগাছা পোস্ট অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। বারে বারে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ চলতে থাকে।

দিনাজপুরঃ

১৯৪২-এর আন্দোলনে দিনাজপুরের বালুরঘাট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এখানে প্রত্যক্ষ এবং অন্তর্ঘাতমূলক উভয় আন্দোলন ঘটেছিল। এখানে সেপ্টেম্বর মাস থেকে আন্দোলন বৃহৎ আকারে সংঘঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সরোজ রঞ্জন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে ১৯৪২-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর আন্দোলনের দিন ঘোষিত হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ১০০ টির বেশী দল আত্রেয়ী নদীর পশ্চিম তীরে উপস্থিত হয়। ৫ হাজারের অধিক মানুষ সমবেত হয়। পরের দিন সরোজ বাবুর নেতৃত্বে পতাকা উত্তোলন করে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবাই 'বন্দেমাতরম' 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি দিতে দিতে শহর অভিমুখে যাত্রা করে। শহরে হরতাল ঘোষণা করা হয়। মিছিল ট্রেজারির নিকট পৌঁছালে ট্রেজারি কর্মীদের চাকুরি ছেড়ে আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানান হয়। সমবেত জনতা এরপর ট্রেজারি,ডাকঘর,দেওয়ানি আদালত ভবন,ব্যাঙ্ক,রেলওয়ে এজেন্সী অফিস,জুট অফিস,এগ্রিকালচারাল অফিস ও গুদাম,ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস প্রভৃতি সরকারী অফিসে আক্রমণ করে। পরে আন্দোলনকারীরা ডঙ্গির হাটের নদী তীরের মজুত সরকারী ধান লুঠ করে জনগণের মধ্যে বন্টন করে। ১৫ তারিখ পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের

খণ্ডযুদ্ধ হয়। ২২ তারিখ জনৈক কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে গেলে প্রচুর সংখ্যক মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে ৬-৭ জন পুলিশকে বেঁধে ফেলে এবং তাদেরকে, তারা চাকুরী ছেড়ে দেবে এই মর্মে স্বাক্ষর করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর পুলিরাঘাটে দুইজন রাজবংশী মানুষকে গ্রেপ্তার করলে প্রচুর মানুষ পুলিশকে আক্রমণ করে। সাঁওতাল অধিবাসীরা তীর ধনুক দিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে সামরিক বাহিনী নামানো হয় এবং সমস্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়। জনসাধারণের বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ব্যাপক সামরিক অত্যাচারের কারনে আন্দোলনকারী জনতা ধীরে ধীরে স্থিমিত হয়ে পড়ে।

নদীয়াঃ

নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়াতে জনগণ আন্দোলন শুরু করে। রানাঘাটে জনতা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন তার কেটে দেয়। নবদ্বীপ পৌরসভার ৭ জন আধিকারিক পদত্যাগ করে। শ্যামনগর ও তার নিকটবর্তী পোস্ট অফিস জ্বালিয়ে দেয় জনতা। কৃষ্ণনগরে রেলগাড়ির ৪টি বগি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয়,বেলডাঙ্গা ও আজিমগঞ্জের রেল স্টেশনে ভাঙ্গচুর করা হয়। মুড়াগাছা স্টেশনেও অগ্নি সংযোগ করা হয়।

হুগলীঃ

হুগলী জেলায় আন্দোলন গড়ে ওঠার পূর্বেই ছোট-বড় সকল নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ দ্রুত নিজেদের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করে। হুগলী জেলার মানুষেরা জয়প্রকাশ নারায়ন-এর গেরিলা কায়দায় আন্দোলনের কৌশল গ্রহণ করে। এখানে যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সদস্যরা আন্দোলনে যোগ দেয়। হুগলী জেলার সর্বত্র গোপন সংঘটন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। কর্মীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে এক এক ভাগকে এক এক দায়িত্ব দেওয়া হয়। কোন দল সাধারণ মানুষদের নিয়ে আন্দোলন করে থানা,আদালত,ও অন্যান্য সরকারী ভবনে পতাকা উত্তোলন করে। অন্য দল শ্রীরামপুর, ভাণ্ডারহাটি রেল লাইন ও স্টেশনের ক্ষতি করে এবং ধনিয়াখালি থানা আক্রমণ করে। গোঘাটের নকুণ্ডা ও বদনগঞ্জের মানুষ গোঘাট থানা আক্রমণ করে, পোস্ট অফিস পুড়িয়ে দেয়। আরামবাগে আন্দোলনকারীরা কোর্ট দখল করে। প্রচুর পরিমাণে গ্রেপ্তার ও পুলিশী অত্যাচারের কারণে ১৯৪৩-এর পর হুগলী জেলাতে আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায়।

পুরুলিয়াঃ

১৯৪২-এর ১০ই আগস্ট সকালে পুরুলিয়ার পুলিশ বিপ্লবী কেন্দ্র শিল্পাশ্রমে তল্লাশি করে,মুক্তি প্রেশ,নিবারণ পল্লী শিল্প সংঘ এবং কংগ্রেস অফিস ও আশ্রম বন্ধ করে দেয়। বম্বে অধিবেশন ফেরৎ নেতা অতুলচন্দ্র বাবুকে গ্রেপ্তার করে। তথাপি ১৭ই আগস্ট পুরুলিয়া শহরের সর্বত্র ও কোর্ট চত্তরে শোভাযাত্রা হয়। ধানবাদ ও ঝরিয়াতে মিছিলের সাথে পোস্ট অফিস ও রেল স্টেশনের ক্ষতি করা হয়। ১৯শে আগস্ট সমস্ত মদের দোকানে পিকেটিং করা হয়। মানভূমের ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে ধর্মঘট পালিত হয়। মান বাজার কোর্ট এরিয়ায় ২২ তারিখ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর এখানে ৫ শতাধীক মানুষ মানবাজার থানা আক্রমণ করে এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ২জন শহীদ হন। ২৩ ও ২৪ আগস্ট বরাবাজারে জনতা থানা আক্রমণ করে দারোগাসহ সিপাহীদের বেঁধে ফেলেন। মদের গুদাম ও পোস্ট অফিস ধ্বংস করা হয়। এখানে এক সপ্তাহ জনতার রাজ চলে। বন্দোয়ান থানার মাথায় পতাকা উত্তোলন করা হয় ও নিকটবর্তী একটি থানার মধ্যে জনতা সভার আয়োজন করে। বেশ কয়েক জায়গায় মিলিটারী পোস্ট ও থানায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। এভাবে পুরুলিয়ার সর্বত্র জনগণ গেরিলা পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে থাকে।

বর্ধমানঃ

বর্ধমানের ভারতছাড়ো আন্দোলনে শুরু থেকে ছাত্র সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৭ই আগস্ট বিভিন্ন স্থান থেকে শোভাযাত্রা এসে বর্ধমান কোর্টের মুখে পিকেটিং করে। পুলিশ তাদের উপর ব্যাপক অত্যাচার করে। ফলে পরের দিন বিক্ষুব্ধ জনতা রেল স্টেশন আক্রমণ করে। ১৩ ই সেপ্টেম্বর কালনা শহরে হরতাল পালিত হয় ও পোস্ট অফিস লুঠ করা হয়। কয়েক স্থানে পোস্ট অফিস ধ্বংস করা হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর আন্দোলনকারীরা কালনার সরকারী আদালত ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। বামানিয়া গ্রামের ক্যানাল অফিস, জামালপুরের পোস্ট অফিস,রেল স্টেশন, আবগারী দোকান,থানা এবং নবস্থা পোস্ট অফিস সর্বত্র অগ্নি সংযোগ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য এই সকল জেলার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি জেলাতেও আন্দোলন হয়েছিল। যেমন- যশোহরে ১৬ই আগস্ট খুলনার নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় এবং ২২শে সেপ্টেম্বর জনতা রেল স্টেশনের দলিলপত্র পুড়িয়ে দেয়। ১১ সেপ্টেম্বর বগুড়ায় জনতা কালেক্টরী ভবনের কাগজপত্র নষ্ট করে,ভালুরপাড়া রেল স্টেশনে রেলের দুটি কামরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। বোলপুরে ২৯শে আগস্ট হিন্দু,মুসলিম,সাঁওতাল মানুষেরা রেল স্টেশনের ক্ষতি করে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন ধ্বংস করে এবং পুলিশের সাথে সংগ্রামে বহু জনতা আহত হয়। মালদহ জেলার রতন থানার অন্তর্গত পোস্ট অফিস, আবগারী দোকান,ইউনিয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সরকারী অফিসে অগ্নি সংযোগ করা হয়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন নষ্ট করা হয়। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে ৯ই সেপ্টেম্বর মহাদেব দেশাই-এর মৃত্যুর প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। বিশাল শোভাযাত্রা বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে থানার সামনে সমবেত হলে পুলিশ তাদের গুলি করলে ৩ জন মারা যায় ও বহু সংখ্যক আহত হয়। ফলে বেশ কিছু দিন এখানে আন্দোলন চলে।

তাই সার্বিকভাবে বলা যায় বাংলার প্রতিটি জেলার শহর থেকে গ্রাম সমস্ত স্তরের মানুষ নানাভাবে ভারতছাড়ো আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। প্রত্যক্ষ আন্দোলন ছাড়াও বহু মানুষ গান্ধীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে চরকা কাটা বা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্য দিয়ে অহিংস পথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলার প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। সরকারী নিপীড়ন এবং বাধ্যবাধকতার কারণে সে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ হতে পারেনি বলে আমাদের সামনে তা অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। একথা স্বীকার্য যে অনেক প্রদেশের আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না থাকায় সে সব আন্দোলনের গভীরতা সঠিকভাবে তুলে ধরা যায়নি।

উপসংহার(Conclusion):

১৯৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ট আন্দোলন। এই আন্দোলন ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা বুঝতে পারে এদেশে শাসন কায়েম রাখা তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তবে বাংলায় ভারতছাড়ো আন্দোলন কিন্তু অহিংস ছিল না। স্বাধীনতা লাভের জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ নিরস্ত্র মানুষের পক্ষে যতটা হিংসাত্মক হওয়া সম্ভব ততটাই তারা আগ্রাসন দেখিয়েছিল। অপর একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে বাংলা প্রদেশের ভারতছাড়ো আন্দোলনে ব্যাক্তি সুভাষ বসু-র সংগ্রামের প্রভাব ছিল। বাংলার নারী সমাজ আন্দোলনে পুরুষদের সাথে সমান্তরাল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে সারা ভারতের মত এখানে ও মুসলিম শ্রেণী এবং কমিউনিস্ট দলের বড় অংশ আন্দোলনে সামিল হয়নি। তবে সর্বশেষে একথা অবশ্যই বলতে হবে বাংলা প্রদেশের ভারতছাড়ো আন্দোলন ভারতের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রদেশের মতই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। সরকারী দমন নীতির নৃশংসতা এবং যোগ্য নেতার অভাবে সমগ্র আন্দোলন একত্রিতভাবে পরিচালিত করা সম্ভব না হলেও বাংলার ভারতছাড়ো আন্দোলনের কথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তথ্যসূত্র(Reference):

১) কলকাতা মহানগরী এবং সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন--ড. কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩।

২) D.G. Tendulkar, Mahatma, Vol.6, Publication Division, Govt. of India,1969 Reprint.

৩) মজুমদার রমেশ চন্দ্র,বাংলাদেশের ইতিহাস ৪তুর্থ খণ্ড, ১৯৭৫,পৃঃ ৩৬৫-৬৬।

৪) আগস্ট বিপ্লব ও বাংলা--সম্পাদনা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য,সজল বসু ও পবিত্রকুমার গুপ্ত, আগস্ট বিপ্লব সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন সমিতি ১৯৯৫।

৫) স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস(১৮৮৫-১৯৯২)—অমলেশ ত্রিপাঠী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা ১৩৯৭।

৬) আগস্ট বিপ্লব,১৯৪২(বাংলা ও অসম) প্রথম খণ্ড—তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী, কলকাতা ১৯৪৬।

৭) ভারত ইতিহাসের দুই ব্যক্তিত্ব-মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু,একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা—রঞ্জিত সেন,মিত্রম্, ২০২২, পৃঃ ১৩৬-১৩৯।

৮) বাংলার জাতীয়তাবাদ (১৮০০-১৯৭১), সম্পাদনা গৌতম মুখোপাধ্যায় ও সমরকান্তি চক্রবর্তী, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২৩, পৃঃ ২৫৯-২৬৯।

৯) ভারতছাড়ো আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর;জনগণের ভূমিকা—গৌতম নিয়োগী,১৯৯২, পৃঃ ৩৫৬-৩৬৫।

১০) ভারতছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুর—সুবর্ণ রায়,পুরশ্রী, ১৯৯৩ পৃঃ ২৪-২৬।

১১) স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা—নরহরি কবিরাজ।

১২) ঔপনিবেশিক আমলে বাংলা (১৭৫৭-১৯৪৭)—গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,২০২৩, পৃঃ ৪৫৯-৪৬২।

১৩) অহিংস আন্দোলনে নিবেদিত নারী—চিন্ময় চৌধুরী,দে'জ পাবলিশিং,২০০১,পৃঃ১৫-১৮।

১৪) স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী—কমলা দাসগুপ্ত,জয়শ্রী প্রকাশন,১৩৭০।

১৫) মাতঙ্গিনী হাজরা এবং আরও বীর নারী—দেবল দেব বর্মা,দে'জ পাবলিশিং,২০১৭,পৃঃ২১-৩০।

১৬) বাংলার মুক্তি সন্ধানী—সব্যসাচী ও রাখী চট্টোপাধ্যায়,পশ্চিম বঙ্গ ইতিহাস সংসদ,পৃঃ১৮১ এবং ১৮৫-১৮৬।